ব্রজেন জমিদারের বন্দুক

প্রচেত গুপ্ত

আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। তা হলে কি জিনিসটা নেই? সবটাই গল্প?

আমরা থাকি আকাশপুর গ্রামে। ফুটবল খেলি, গাছে চড়ি, পুকুরে ঝাঁপাই। এর সঙ্গে আবার আমাদের গ্রামে টিভি, ইন্টারনেট, ভিডিও গেম আছে। তাই আমরা যেমন মস্ত বড় মাঠে ফুটবল খেলতে পারি, তেমন আবার টিভিতে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলও দেখতে পাই। গ্রামে বন্ধুদের সঙ্গে গাছে চড়ি, আবার ইন্টারনেটে সিডনি, হনলুলুর বন্ধুদের সঙ্গে গল্পও করি। পুকুরে চাকতি ছুড়ে ব্যাং লাফাই, আবার ভিডিও গেমে ফ্লাইং সসারও খেলি। আমাদের মজার শেষ নেই। তারপরও আমাদের মনখারাপ। সেই মনখারাপ আর পাঁচটা মনখারাপের মতো নয়। অন্য রকম মনখারাপ। গত একবছর ধরে এই অবস্থা চলছে। কিছুদিন হল মনখারাপ সন্দেহের দিকে মোড় নিয়েছে।

ঘটনাটা বললেই সব পরিষ্কার হবে।

এক-একটা গ্রামে এক-একটা জিনিস নাম করে। সেই 'নামকরা জিনিস' নিয়ে গ্রামের মানুষের গর্বের সীমা থাকে না। গ্রামের মানুষ তার কথা সকলকে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায়। যেমন, আমাদের পাশের গ্রাম। আমাদের পাশের গ্রামের নাম বাতাসপুর। আকাশপুরের পাশে বাতাসপুর। বাতাসপুরের নামকরা জিনিস হল একটা বট গাছ। সকলে বলে, 'ঠাকুরদা বট গাছ'। গাছের ইয়া মোটা গুঁড়িটা হঠাৎ দেখলে মনে হবে চোখ-মুখ রয়েছে। ডালপালাগুলো যেন মাথার ঝাঁকড়া চুল, আর নেমে আসা ঝুরিগুলো গোঁফদাড়ি। ঠিক যেন একটা বুড়ো মানুষ হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। বাতাসপুরের ছেলেরা 'ঠাকুরদা গাছ' নিয়ে খুব উত্তেজিত। আবার আমার মামাদের গ্রামে নাম করেছে একটা ভাঙা মন্দির। মন্দিরের বয়স কত? কেউ বলে পাঁচশো, কেউ বলে হাজার। মন্দিরের বেশি অংশটাই ভেঙে গিয়েছে। তারপরেও গায়ের কারুকাজ বোঝা যায়। দেখলে অবাক লাগে। অত বছর আগেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পীরা কী সুন্দর ইটপাথর খোদাই করে ছবি আঁকতেন। সেইসব পাথর, ইঁট রক্ষা করার জন্য মামারা গ্রামে পাহারার ব্যবস্থা করেছে। বেড়া দিয়েছে, আলো লাগিয়েছে। আরও আছে। আমাদের ক্লাসে পড়ে ছোট্টু। তার মাসির বাড়ি দিঘি গ্রামে। দিঘি গ্রামের স্পেশাল ব্যাপার হল দিঘি। একটা নয়, ওই গ্রামে বড়-বড় তিনটে দিঘি আছে। দিঘি সব গ্রামেই থাকে। তিনটে না হোক, একটা-দুটো তো থাকেই। ছোট্টুর মাসির গ্রামের দিঘি অন্য রকম। সেই তিন দিঘির জল তিন রঙের। কালো, নীল আর টলটলে। একটার কোনও রং নেই বলে টলটলে। দিঘির পাড়ে শনশন বাতাস বয়। জলে ঢেউ ওঠে। আমাদের বিতানের পিসেমশাইয়ের গ্রামও কম যায় না। বর্ধমানের এই গ্রাম মেলার জন্য বিখ্যাত। সাতদিন ধরে হইচই চলে। ক্লাস এইটের আর্যর ন'কাকার বাড়ি মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে। সেই গ্রামে একটা কামান রয়েছে! সবাই বলে, রাজা-বাদশাহের আমলের কামান। কোনও এক যুদ্ধের সময় নাকি সৈন্যরা ফেলে পালিয়েছিল। কামানের জন্য ওই গ্রামের নামই হয়ে গিয়েছে কামানগ্রাম।

নিয়ম হল, বাইরের কেউ এলে একবার করে গ্রামের 'নামকরা জিনিস' দেখতে যায়। আর্যর কাছে গল্প শুনেছি, ওর ন'কাকার কামান গ্রামে শীতের সময় খুব ভিড় হয়। সবাই নদীর ধারে, ঝরনার ধারে, জঙ্গলের ধারে পিকনিক করে, ন'কাকার গ্রামে গিয়ে মানুষ কামানের ধারে পিকনিক করে। কামানের গায়ে হাত রেখে ফোটো তোলে। বিতানের কাছেও একটা ফোটো আছে। সে মাঝেমধ্যে ক্লাসে ফোটোটা বের করে। আমরা কাড়াকাড়ি করে দেখি। গদগদ মুখে বিতান কামানের উপর বসে আছে। রাগে, দুঃখে গা চিড়বিড় করে ওঠে। ভাবি, ইস, এরকম ফোটো তো আমাদেরও থাকতে পারত।

এক বছর হল, আমরা জানতে পেরেছি, আমাদের গ্রামেও একটা নামকরা জিনিস আছে। বুড়ো বট গাছ, তিন রঙের দিঘি, পুরনো মন্দির, নবাব-বাদশাহের কামানের চেয়ে সে জিনিস কম কিছু নয়। বরং অনেক বেশি রোমহর্ষক, গা ছমছমে, বুক টিপটিপ করা। আমরা সকলের কাছে সে জিনিসের গল্পও করি। কিন্তু আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না। ঠাট্টা করে। এই তো সেদিন ছোটমামা বলল, "এই গল্প আর কতবার শোনাবি?"

আমি রাগ-রাগ গলায় বললাম, "গল্প কেন হবে? একেবারে সত্যি।"

ছোটমামা ভুরু কুঁচকে বলল, "সত্যি হলে দেখাতে কী অসুবিধে? এতদিন হয়ে গেল শুধু শুনেই যাচ্ছি। এটা কি লুকিয়ে রাখার জিনিস? এ তো বুক ফুলিয়ে দেখানোর কথা। তোরা নিজেরাও তো কখনও দেখিসনি। দেখেছিস?"

আমি চুপ করে থাকি। ছোটমামা ফিক করে হেসে বলে, "মন খারাপ করিস না। সব গ্রামে কি আর দেখানোর মতো জিনিস থাকে? তোরা বরং বাইরে থেকে কেউ এলে তোদের গ্রামের পচা ডোবা, ভাঙা রাস্তা, কাঁটা গাছের ঝোপ দেখাস।"

ছোটমামার উপর রাগ হয়। কিছু বলতে পারি না। যতই হোক, গুরুজন মানুষ। কিন্তু সকলে তো আর গুরুজন নয়। তখন গোলমাল লাগে। বাতাসপুরের অর্জুনের সঙ্গে আমাদের সুমাল্যের হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। সুমাল্যকে একদিন অর্জুন বলেছে, "কীরে সুমাল্য, তোদের সেই ঘোড়ার ডিমের খবর কী? যা হয় না, দেখাও যায় না, কবে দেখাবি? যেদিন দেখাবি আগে থেকে জানাস। ব্যান্ডপার্টি নিয়ে যাব।"

সুমাল্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অর্জুনের উপর। রাগ হলেও বুঝতে পারি, সকলে ঠাট্টা তো করবেই। আকাশপুরের নামকরা জিনিস তো কাউকে দেখাতেই পারলাম না। পারব কি? আমরা নিজেরাই তো কখনও চোখে দেখিনি। শুধু গল্পই শুনেছি।

রোমহর্ষক সেই গল্প একটা বন্দুকের। দোনলা বন্দুক।

বন্দুক লম্বায় তিন ফুটের বেশি। স্টিলের দুটো নল। উপরেরটা সামান্য বড়। নল শেষ হলে মেহগিনি কাঠের বাঁট। কাঠের গায়ে সোনালি রঙের লতাপাতার নকশা। বাঁটের পিছনে ইংরেজিতে লেখা, 'মেড ইন ইতালি'। পিতলের মস্ত বড় ট্রিগার। কাঁধে ঝুলিয়ে ঘোরার জন্য পাকাপোক্ত বেল্ট রয়েছে। আর গুলি ছোড়ার সময় বন্দুক রাখতে হয় কাঁধের উপর। নলের উপরে রয়েছে 'মাছি'। মাথা ভাঙা পেরেকের মতো। এক চোখ বন্ধ করে, এক চোখে সেই মাছি দেখে লক্ষ্য স্থির করতে হয়। তারপর ট্রিগার টানলেই আগুনের হলকা নিয়ে ছুটবে গুলি। একটা ট্রিগার টানা হলে, আর-একটা। গুলির সঙ্গে-সঙ্গে বন্দুক ধাক্কাও মারে। বন্দুকধারীর শরীরে জোর না থাকলে সেই ধাক্কায় ধরাশায়ী হওয়া আশ্চর্যের নয়। বন্দুকের বয়স নাকি কম করে দেড়শো বছর। বেশিও হতে পারে। নলের গায়ে যেখানে সাল লেখা আছে জায়গাটা ঘষা। তাই বয়সের কথা সঠিক বলা মুশকিল। বয়স যাই হোক, এই বন্দুক আর পাঁচটা বন্দুকের মতো সাধারণ বন্দুক নয়। এই বন্দুকের ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসে একই সঙ্গে জমিদার আছে, সাহেব আছে, বাঘ আছে, আবার দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই। এই জিনিস নামকরা হবে না তো কে হবে?

তখন দেশে ইংরেজদের শাসন। জমিদার ব্রজেন্দ্রকান্তি নন্দীর ছিল বিরাট প্রতাপ। সকলে ডাকত, ব্রজেন জমিদার। ব্রজেন জমিদারের জমিদারিও ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। জমিদারির মধ্যে যেমন বসতি ছিল, তেমন নদী ছিল, জঙ্গল ছিল। জঙ্গলে ছিল নানা ধরনের পশুপাখি। জমিদার দাপুটে হলে কী হবে, বনের পশুপাখি মারা মোটে পছন্দ করতেন না। তার জমিদারিতে শিকার ছিল নিষিদ্ধ। একবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক সাহেব খবর পেয়ে ব্রজেন জমিদারের জঙ্গলে এসেছিলেন পাখি শিকার করতে। অনুমতি তো দূরের কথা, ব্রজেন্দ্রকান্তিকে খবর দেওয়ার প্রয়োজনটুকু পর্যন্ত মনে করলেন না। জঙ্গলের ভিতর বড় দিঘি। শীতের সময়ে পাখিরা সেখানে ভিড় করত। সাহেবের সঙ্গে ছিল এয়ারগান আর ছররা গুলি। পাখি মারতে এয়ারগান আর ছররা গুলিই যথেষ্ট। সাহেব বিশেষ সঙ্গীসাথীও সঙ্গে আনেননি। কাঁধে এয়ারগান নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সাহেব। পাখির খোঁজে চোখ উপরে। পায়ের কাছে কখন এসে যে বাঘ ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসেছে, বেচারা জানতেও পারেননি। যখন জানলেন, ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। চাপা হুঙ্কারে চোখ নামাতেই একেবারে বাঘের মুখোমুখি। সকালের ফটফটে আলোয় হাতকয়েকের মধ্যে বাঘ দেখে সাহেবের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। তাঁকে যারা এই জঙ্গলের খবর দিয়েছিল, তারা নিরীহ পাখির কথা বলেছে, হিংস্র বাঘের কথা বলেনি। ফলে সাহেব সঙ্গে শুধু এয়ারগান নিয়ে এসেছেন। এয়ারগানে আর যাই হোক, বাঘ মারা যায় না। লোকে ঠাট্টা করে বলে, "পাখি শিকারের ছররা গুলি বাঘের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে লাগলে বাঘ নাকি হেসেও ফেলতে পারে।" সাহেবের হাঁটু কাঁপতে শুরু করল। বাংলার বাঘ তো সাহেবকে দেখে প্রথমে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। তারপর মস্ত হাঁ করে একটা দাঁতখিঁচুনি দিল জম্পেস করে। সাহেবের হাত থেকে এয়ারগান পড়ল খসে। দাঁতে দাঁত গেল লেগে। যাকে বলে দাঁতকপাটি। বাঘ কয়েক পা এগিয়ে এসে, ডান পায়ের থাবাটা তুলল। যেন সাহেবের গালে চড় কষাবে। আর তখনই শোনা গেল, ঢাক, ঢোল, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে হইচই করে কারা যেন ছুটে আসছে। বাঘ থমকে গেল। জ্ঞান হারাবার আগে সাহেব দেখলেন, হট্টগোলে ঘাবড়ে গিয়ে বাঘ ঝোপজঙ্গল টপকে উলটোদিকে দৌড় দিয়েছে। সাহেব ভাবলেন, তিনি ভুল দেখছেন। জ্ঞান হারানোর সময় মানুষ ভুল দেখে। বাঘ আসলে তাঁর দিকেই আসছে।

না, সাহেব ভুল দেখেননি। সত্যি-সত্যি লোকলস্কর নিয়ে সেদিন জঙ্গলের ভিতর হাজির হয়েছিলেন ব্রজেন জমিদার। সাহেব তাঁকে না জানিয়ে তাঁর এলাকায় শিকারে এসেছেন শুনে তিনি রেগে আগুন হয়েছিলেন। সাহেবের এত সাহস হল কোথা থেকে? বিলেত থেকে এসে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকলস্কর নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা দিয়েছিলেন জমিদার। সাহেবকে ঘাড় ধরে জঙ্গল থেকে বের করে দেবেন। তবে যাওয়ার আগে তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। সাহেবের জানা না থাকলেও, ব্রজেন জমিদারের কাছে খবর ছিল ক'দিন ধরে একটা বাঘ নদী পেরিয়ে এদিকে এসে ঘুরঘুর করছে। সেই কারণে ঢাক-ঢোল-ক্যানেস্তারা, পটকা সঙ্গে নিয়েছিলেন। সাহেব তাড়াতে গিয়ে হঠাৎ যদি বাঘের মুখোমুখি হতে হয়, তা হলে তো বিপদ। বাঘ তো আর মারা যাবে না। তাড়াতে হবে। আর তাতেই সাহেব প্রাণে রক্ষা পেলেন।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে সেই সাহেব নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। না গিয়ে উপায় কী? রাতে চোখ বুজলেই তিনি নাকি দেখতে পেতেন, বাংলার বাঘ দাঁত খিঁচোচ্ছে। তবে যাওয়ার আগে সাহেব, ব্রজেন জমিদারকে উপহার দিয়ে গেলেন। খালি হাতে বাঘ তাড়ানোর উপহার। কাঠের বাক্স করে উপহার এলও। বাক্স খুলতেই স্টিলের নল আর মেহগিনি কাঠের কারুকাজ করা বাঁট নিয়ে ঝলমল করে উঠল দোনলা বন্দুকটা। ব্রজেন জমিদার শিকার করতেন না, কিন্তু বন্দুকটা রাখলেন যত্ন করে। যতই হোক সাহেবের উপহার। তার কদরই আলাদা। বন্দুকটার ব্যাপারে সাধারণ মানুষেরও খুব আগ্রহ ছিল। তারা বাঘের গল্প জেনে গিয়েছিল। কেউ-কেউ বন্দুক দেখতে জমিদারের বাড়িতেও গিয়েছে। তবে বন্দুক পারতপক্ষে বের করতেন না ব্রজেন জমিদার। বলতেন, "বন্দুক পাথরের মূর্তি নয় যে, জমিদারবাড়ির গেটের মাথায় বসিয়ে সবাইকে দেখাতে হবে। বন্দুক কাজের জিনিস। তাকে দেখা যাবে কাজের সময়। সাহেব উপহার দিয়েছে বলেই গদগদ হয়ে জিনিসটা দেখিয়ে বেড়াতে হবে নাকি? ছিঃ। এমন মানুষ ব্রজেন জমিদার নয়।"

সত্যি কাজের সময় বন্দুক বের করেছিলেন ব্রজেন জমিদার। সাহেবের দেওয়া বন্দুক দিয়ে সাহেবদের বিরুদ্ধেই লড়েছেন। কাউকে গুলি না করলেও, ভয় দেখিয়েছেন। বহুদিন পর্যন্ত তাঁর জমিদারিতে ব্রিটিশরা নাক গলাতে পারেনি। প্রজাদের উপর অত্যাচারের খবর পেলেই ছুটে যেতেন। যাওয়ার আগে হুঙ্কার দিতেন, "ওরে কে আছিস? বন্দুকটা নিয়ে আয় দেখি।"

ব্রজেন জমিদার মারা গেলেন। তাঁর কোনও সন্তান ছিল না। আত্মীয়রাই বিষয়সম্পত্তির ভাগ করে নিল। ভাগাভাগির সময় বন্দুক নিলেন জমিদারের এক দূরসম্পর্কের কাকা। তাঁর ছিল নামকরা জিনিস সংগ্রহের নেশা। সেই কাকার লতাপাতায় আত্মীয় হলেন আমাদের হরেনকাকা। বছরদেড়েক হল পটনা না গয়া শহর ছেড়ে আমাদের আকাশপুর গ্রামে এসে নিরিবিলিতে বাড়ি বানিয়ে আছেন। বেশির ভাগ সময়েই বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বই পড়েন। কখনও বাগান করেন, কখনও দিঘিতে মাছ ধরতে যান। শান্তশিষ্ট মানুষ। জমিদারের কাকাতুতো আত্মীয় হওয়ার কারণে তিনি গ্রামের ছোট-বড় সবার কাছেই হরেনকাকা। হরেনকাকার বয়স সত্তরও হতে পারে, আবার আশিও হতে পারে। চোহারা লম্বা-চওড়া, পেটানো। মাথার ঝাঁকড়া চুল সব সাদা। সাদা পায়জামা আর ফতুয়া পরে যখন বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকেন, তাঁকেই জমিদার বলে মনে হয়। বয়স যাই হোক, হরেনকাকা একজন চমৎকার মানুষ। আমরা সুযোগ পেলেই তাঁর কাছে চলে যাই। তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করেন। নানা রকম খাওয়াদাওয়াও হয়।

ব্রজেন জমিদারের বন্দুকের গল্প তাঁর কাছে আমরা শুনেছি। তা প্রায় বছরখানেক হতে চলল। গল্প শুনতে-শুনতে উত্তেজনায় আমাদের চোখ বড় আর মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। আমি ঢোক গিলে বললাম, "বন্দুকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে?"

হরেনকাকা বললেন, "নষ্ট হবে কেন? দিব্যি আছে। চকচকে ঝকঝকে। কার্টিজ ভরে ট্রিগার টিপলেই হয়। আগুনের গুলি ছুটবে।"

ছোট্ট কাঁপা গলায় বলল, "বন্দুকটা এখন কার কাছে আছে হরেনকাকা?"

হরেনকাকা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, "আমার কাছে। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই বন্দুকের মালিক এখন আমি। জমিদার ব্রজেন্দ্রকান্তি নন্দীর মৃত্যুর পর যখন তাঁর সম্পত্তি ভাগাভাগি হল, তখন তাঁর কাকা, মানে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা..."

আমাদের কানে আর কিছু ঢুকল না। আমরা অনেকক্ষণ কথাও বলতে পারলাম না। হরেনকাকা বলছেন কী! এমন একটা জিনিস আমাদের গ্রামে রয়েছে! এই আকাশপুরে? অথচ আমরা জানতামই না! এই বন্দুকের কথা জানাজানি হলে আকাশপুরের নাম হইহই করে সবদিকে ছড়িয়ে যাবে। সব 'নামকরা'দের টপকে আমরা একনম্বর 'নামকরা' হয়ে যাব।

হরেনকাকা বললেন, "এরকম একটা মূল্যবান জিনিস কাছে রাখতে পেরে আমি খুবই গর্বিত। বন্দুকটার সঙ্গে কত ঘটনা জড়িয়ে আছে। শুধু সাহেব আর জমিদার নয়, আছে পশুপাখির প্রতি মমত্ব, আছে দেশের জন্য ভালবাসা।"

সুমান্য হেসে বলল, "গর্ব তো শুধু আপনি একা করলে হবে না হরেনকাকা। ভাগ আমাদেরও দিতে হবে। এবার আমরাও বুক ফুলিয়ে বলব, গর্ব করার মতো একটা জিনিস আমাদের আকাশপুরে আছে। এই বন্দুকের গল্প আমরা সকলকে করব।"

হরেনকাকা মাথা নেড়ে বললেন, "অবশ্যই করবে। গল্প করার মতোই তো ঘটনা।"

আমি বললাম, "শুধু গল্পে হবে না। আমাদের গ্রামে কেউ বেড়াতেটেড়াতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলে আপনার বাড়িতে নিয়ে আসব হরেনকাকা। আপনি বন্দুকটা দেখাবেন। হয়ে যাবে।"

ছোটু একগাল হেসে বলল, "হাতে নিয়ে যদি কেউ ফোটো তুলতে চায় তুলবে। আমাদের কোনও আপত্তি নেই।"

ঋদ্ধি উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "গ্রামের মাঝখানে একটা জায়গায় বন্দুকটা রাখা যেতে পারে। যেমন পথের মোড়ে স্ট্যাচু থাকে না? ওইরকম। বন্দুকটার চারপাশে বাগান থাকবে, ফোয়ারা থাকবে। চারপাশে বেড়া। যাতে কেউ বন্দুকে হাত না দিতে পারে। ইচ্ছে করলে সেখানে বসে পিকনিকও করা যাবে। বিতানের ন'কাকার গ্রামে যেমন কামানের পাশে হয়।"

হরেনকাকা আমাদের কথা শুনে হাঁ হয়ে গেলেন। বললেন, "এসব কী বলছ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আমি হেসে বললাম, "আপনাকে কিছু বুঝতে হবে না হরেনকাকা। সব ব্যবস্থা আমরা করব। আমরা হ্যান্ডবিল ছাপাব। আশপাশের বিশটা গ্রামে বিলি করব। কলকাতায় পত্রপত্রিকার অফিসেও পাঠাব। হ্যান্ডবিলের উপর লেখা থাকবে, আকাশপুরের গর্ব। ব্রজেন জমিদারের বন্দুক।"

আর্য বলল, "খুব ভাল হবে। এতদিনে একটা বদলার মতো বদলা হবে। হরেনকাকা, এবার বন্দুকটা নিয়ে আসুন। আমরা একবার প্রাণভরে দেখি।"

হরেনকাকা, দু'পাশে মাথা নেড়ে বললেন, "তা তো হবে না। বন্দুক তো আমি দেখাতে পারব না।"

আমরা অবাক হয়ে বললাম, "সে কী! কেন?"

হরেনকাকা সামান্য হেসে বললেন, "ব্রজেন্দ্রকান্তি এটা পছন্দ করতেন না। বলতেন, কাজের জিনিস কাজের সময় বের করা হবে। তোমাদের তো বলেছি।"

আমরা ভেঙে পড়লাম। বন্দুকটা দেখাই যাবে না। তা হলে তো কোনও লাভ নেই। গ্রামের একমাত্র 'দেখার জিনিস' যদি দেখাই না যায়, তা হলে আমরা গর্ব করে সকলকে কী বলব? লোকে বিশ্বাসই বা করবে কেন? সুমাল্য কাঁচুমাচু গলায় বলল, "একবারের জন্য দেখা যাবে না?"

হরেনকাকা দু'পাশে মাথা নাড়লেন। বললেন, "না। ব্রজেন জমিদার এই জিনিস লোককে দেখিয়ে বেড়ানোর বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি কখনও রাজি হননি। আমি সেই সম্মান নষ্ট করব কী করে?"

অনেক কাকুতি-মিনতি করলাম। হরেনকাকা রাজি হলেন না। তবে আমরা হাল ছাড়লাম না। গ্রামের বড়দের গিয়ে ঘটনাটা বললাম। তাঁরা কয়েকজন উৎসাহ নিয়ে হরেনকাকাকে অনুরোধ করলেন। হরেনকাকা অনড়, অটল। বললেন, "চিন্তা কোরো না, যখন দরকার হবে তখন নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।"

একবছর কেটে গিয়েছে, হরেনকাকা জেদ ভাঙতে পারিনি। অনেককে বন্দুকটার গল্প বলেছি, প্রথমে দু'-একবার মেনে নিলেও পরে আর তারা বিশ্বাস করে না। সত্যি কথা বলতে কী, এবার আমাদের মনেও সন্দেহ দানা বাঁধছে। বন্দুকটা সত্যি আছে তো! নাকি সবটাই গল্প? ঠিক করলাম, হরেনকাকার বাড়িতে লুকিয়ে ঢুকে বন্দুকটা দেখব। এতে আর কিছু না হোক, অন্তত সন্দেহটা দূর হবে। ব্রজেনকাকার বাড়িতে ঢুকেছি, কিন্তু তাঁর শোয়ার ঘরে ঢুকতে পারিনি। সেই ঘরে সবসময় তালা। নিশ্চয়ই ওই ঘরেই বন্দুকটা রয়েছে। পাঁচিল টপকে বাড়ির পিছনে গেলাম। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে যদি দেখা যায়। লাভ হল না। দরজার মতো, হরেনকাকার শোয়ার ঘরের জানলাও বন্ধ থাকে। তখন আমরা ধরলাম, বিশুদাকে। বিশুদা হরেনকাকার বাড়িতে থাকে। হরেনকাকার অ্যাসিস্ট্যান্ট। বললাম, বিশুদা, তুমিই পারবে। হরেনকাকা যখন বিকেলে হাঁটতে বেরোন, আমাদের তাঁর ঘরে ঢুকিয়ে দেবে। আমরা বন্দুকটা একবার চোখের দেখা দেখেই চলে আসব।"

বিশুদা এত বড় জিভ বের করে বলল, "ওরে বাবা! আমি পারব না...আমি পারব না," বলেই দিল একছুট।

সুমাল্য খুব রেগে গিয়েছে। গজগজ করতে-করতে বলল, "পারবে কী করে? থাকলে তো দেখাবে। বন্দুকটাই তো নেই।"

বিতান বলল, "আমাদের প্রেস্টিজ বলে আর কিছু রইল না। এতদিন ধরে সকলকে এত গল্প করলাম...এবার কী করে মুখ দেখাব? আমি আর কোনওদিন হরেনকাকার কাছে যাব না।"

আমারও খুব খারাপ লাগছে। ছোটমামা ঠিকই বলেছে। পচা ডোবা আর কাঁটা গাছের ঝোপ ছাড়া আকাশপুর গ্রামের গর্ব করার মতো কিছু নেই। মনখারাপ আর সন্দেহ নিয়ে আমরা যখন ভেঙে পড়েছি, একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল।

একটা সময় এদিকটায় ডাকাতির খুব চল ছিল। গল্প শুনেছি, কুপকুপে অন্ধকার রাতে ডাকাতরা আসত ঘোড়ায় চেপে। হাতে থাকত মশাল। সঙ্গে থাকত লাঠি, বল্লম। আমাদের গ্রামে এখন নেই। ইলেকট্রিসিটি, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন সবই এসে গিয়েছে, কিন্তু ডাকাতরা আসা বন্ধ করেনি। দু'-চার বছর অন্তর-অন্তর এখনও রাতে দলবেঁধে হাজির হয়। নিশ্চয়ই এরা আগেকার দিনের ঘোড়ায় চাপা ডাকাতদের নাতিপুতি। ঘোড়ার বদলে তারা আসে মোটরবাইকে। পুরনো দিনের মতো মুখে কাপড়, মাথায় ফেট্টিও থাকে। চেনার উপায় নেই। গোটা রাত জুড়ে একসঙ্গে পাঁচ-ছ'টা গ্রামে ডাকাতি করে। টাকাপয়সা, সোনাদানা তো নেয়ই, হাঁসমুরগি, গোলার ফসলও বাদ দেয় না। পুকুরে জাল ফেলে মাছও তুলে নিয়েছে। ভোরের আলো ফোটার আগেই পালায়। গ্রামে রাতপাহারার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সে আর কতটা? ছোটখাট চুরি আটকানো যায়, ডাকাতের মুখোমুখি হওয়া অসম্ভব। ওদের সঙ্গে এখন থাকে লোহার রড, গুলি, বোমা। সেসবের মোকাবিলা করা মানে বেঘোরে প্রাণ দেওয়া। গ্রামের মানুষ যে বাধা দেবে, সে সাহস বা ক্ষমতা কোনওটাই নেই।

বেশ কয়েকবছর পর আকাশপুরে আবার ডাকাতও এল। এবার কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্যরকম। সেই ঘটনা আমরা দেখতে পাইনি। বড়রা আমাদের জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতে দেননি। বাড়িয়েও কোনও লাভ হত না। হরেনকাকার বাড়ি তো আমাদের বাড়ির কাছে নয়। যাদের বাড়ি আশপাশে, তারাই কেবল দেখেছে। পরে তাদের মুখ থেকে শুনেছি।

ডাকাতরা আকাশপুর গ্রামে ঢুকল ভোররাতের দিকে। সম্ভবত আর পাঁচ গ্রামে ডাকাতি করে ফিরে যাওয়ার পথে। মোটরবাইকের বিকট আওয়াজে ঘুম ভাঙল সকলের। কেউ খাটের নীচে ঢুকে কাঁপতে লাগল, কেউ সাহস করে জানলা ফাঁক করে বাইরে তাকাল। আকাশ ফরসা হচ্ছে। সেই আলোয় ডাকাতদলকে যেন খানিকটা ক্লান্তই দেখাচ্ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তারা কোথাও না দাঁড়িয়ে সোজা চলে এল হরেনকাকার বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

গায়ে লাগলে বাঘ নাকি হেসেও ফেলতে পারে।" সাহেবের হাঁটু কাঁপতে শুরু করল। বাংলার বাঘ তো সাহেবকে দেখে প্রথমে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। তারপর মস্ত হাঁ করে একটা দাঁতখিঁচুনি দিল জম্পেস করে। সাহেবের হাত থেকে এয়ারগান পড়ল খসে। দাঁতে দাঁত গেল লেগে। যাকে বলে দাঁতকপাটি। বাঘ কয়েক পা এগিয়ে এসে, ডান পায়ের থাবাটা তুলল। যেন সাহেবের গালে চড় কষাবে। আর তখনই শোনা গেল, ঢাক, ঢোল, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে হইচই করে কারা যেন ছুটে আসছে। বাঘ থমকে গেল। জ্ঞান হারাবার আগে সাহেব দেখলেন, হট্টগোলে ঘাবড়ে গিয়ে বাঘ ঝোপজঙ্গল টপকে উলটোদিকে দৌড় দিয়েছে। সাহেব ভাবলেন, তিনি ভুল দেখছেন। জ্ঞান হারানোর সময় মানুষ ভুল দেখে। বাঘ আসলে তাঁর দিকেই আসছে।

না, সাহেব ভুল দেখেননি। সত্যি-সত্যি লোকলস্কর নিয়ে সেদিন জঙ্গলের ভিতর হাজির হয়েছিলেন ব্রজেন জমিদার। সাহেব তাঁকে না জানিয়ে তাঁর এলাকায় শিকারে এসেছেন শুনে তিনি রেগে আগুন হয়েছিলেন। সাহেবের এত সাহস হল কোথা থেকে? বিলেত থেকে এসে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকলস্কর নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা দিয়েছিলেন জমিদার। সাহেবকে ঘাড় ধরে জঙ্গল থেকে বের করে দেবেন। তবে যাওয়ার আগে তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। সাহেবের জানা না থাকলেও, ব্রজেন জমিদারের কাছে খবর ছিল ক'দিন ধরে একটা বাঘ নদী পেরিয়ে এদিকে এসে ঘুরঘুর করছে। সেই কারণে ঢাক-ঢোল-ক্যানেস্তারা, পটকা সঙ্গে নিয়েছিলেন। সাহেব তাড়াতে গিয়ে হঠাৎ যদি বাঘের মুখোমুখি হতে হয়, তা হলে তো বিপদ। বাঘ তো আর মারা যাবে না। তাড়াতে হবে। আর তাতেই সাহেব প্রাণে রক্ষা পেলেন।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে সেই সাহেব নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। না গিয়ে উপায় কী? রাতে চোখ বুজলেই তিনি নাকি দেখতে পেতেন, বাংলার বাঘ দাঁত খিঁচোচ্ছে। তবে যাওয়ার আগে সাহেব, ব্রজেন জমিদারকে উপহার দিয়ে গেলেন। খালি হাতে বাঘ তাড়ানোর উপহার। কাঠের বাক্স করে উপহার এলও। বাক্স খুলতেই স্টিলের নল আর মেহগিনি কাঠের কারুকাজ করা বাঁট নিয়ে ঝলমল করে উঠল দোনলা বন্দুকটা। ব্রজেন জমিদার শিকার করতেন না, কিন্তু বন্দুকটা রাখলেন যত্ন করে। যতই হোক সাহেবের উপহার। তার কদরই আলাদা। বন্দুকটার ব্যাপারে সাধারণ মানুষেরও খুব আগ্রহ ছিল। তারা বাঘের গল্প জেনে গিয়েছিল। কেউ-কেউ বন্দুক দেখতে জমিদারের বাড়িতেও গিয়েছে। তবে বন্দুক পারতপক্ষে বের করতেন না ব্রজেন জমিদার। বলতেন, "বন্দুক পাথরের মূর্তি নয় যে, জমিদারবাড়ির গেটের মাথায় বসিয়ে সবাইকে দেখাতে হবে। বন্দুক কাজের জিনিস। তাকে দেখা যাবে কাজের সময়। সাহেব উপহার দিয়েছে বলেই গদগদ হয়ে জিনিসটা দেখিয়ে বেড়াতে হবে নাকি? ছিঃ। এমন মানুষ ব্রজেন জমিদার নয়।"

সত্যি কাজের সময় বন্দুক বের করেছিলেন ব্রজেন জমিদার। সাহেবের দেওয়া বন্দুক দিয়ে সাহেবদের বিরুদ্ধেই লড়েছেন। কাউকে গুলি না করলেও, ভয় দেখিয়েছেন। বহুদিন পর্যন্ত তাঁর জমিদারিতে ব্রিটিশরা নাক গলাতে পারেনি। প্রজাদের উপর অত্যাচারের খবর পেলেই ছুটে যেতেন। যাওয়ার আগে হুঙ্কার দিতেন, "ওরে কে আছিস? বন্দুকটা নিয়ে আয় দেখি।"

ব্রজেন জমিদার মারা গেলেন। তাঁর কোনও সন্তান ছিল না। আত্মীয়রাই বিষয়সম্পত্তির ভাগ করে নিল। ভাগাভাগির সময় বন্দুক নিলেন জমিদারের এক দূরসম্পর্কের কাকা। তাঁর ছিল নামকরা জিনিস সংগ্রহের নেশা। সেই কাকার লতাপাতায় আত্মীয় হলেন আমাদের হরেনকাকা। বছরদেড়েক হল পটনা না গয়া শহর ছেড়ে আমাদের আকাশপুর গ্রামে এসে নিরিবিলিতে বাড়ি বানিয়ে আছেন। বেশির ভাগ সময়েই বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বই পড়েন। কখনও বাগান করেন, কখনও দিঘিতে মাছ ধরতে যান। শান্তশিষ্ট মানুষ। জমিদারের কাকাতুতো আত্মীয় হওয়ার কারণে তিনি গ্রামের ছোট-বড় সবার কাছেই হরেনকাকা। হরেনকাকার বয়স সত্তরও হতে পারে, আবার আশিও হতে পারে। চোহারা লম্বা-চওড়া, পেটানো। মাথার ঝাঁকড়া চুল সব সাদা। সাদা পায়জামা আর ফতুয়া পরে যখন বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকেন, তাঁকেই জমিদার বলে মনে হয়। বয়স যাই হোক, হরেনকাকা একজন চমৎকার মানুষ। আমরা সুযোগ পেলেই তাঁর কাছে চলে যাই। তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করেন। নানা রকম খাওয়াদাওয়াও হয়।

ব্রজেন জমিদারের বন্দুকের গল্প তাঁর কাছে আমরা শুনেছি। তা প্রায় বছরখানেক হতে চলল। গল্প শুনতে-শুনতে উত্তেজনায় আমাদের চোখ বড় আর মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। আমি ঢোক গিলে বললাম, "বন্দুকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে?"

হরেনকাকা বললেন, "নষ্ট হবে কেন? দিব্যি আছে। চকচকে ঝকঝকে। কার্টিজ ভরে ট্রিগার টিপলেই হয়। আগুনের গুলি ছুটবে।"

ছোট্ট কাঁপা গলায় বলল, "বন্দুকটা এখন কার কাছে আছে হরেনকাকা?"

হরেনকাকা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, "আমার কাছে। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই বন্দুকের মালিক এখন আমি। জমিদার ব্রজেন্দ্রকান্তি নন্দীর মৃত্যুর পর যখন তাঁর সম্পত্তি ভাগাভাগি হল, তখন তাঁর কাকা, মানে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা..."

আমাদের কানে আর কিছু ঢুকল না। আমরা অনেকক্ষণ কথাও বলতে পারলাম না। হরেনকাকা বলছেন কী! এমন একটা জিনিস আমাদের গ্রামে রয়েছে! এই আকাশপুরে? অথচ আমরা জানতামই না! এই বন্দুকের কথা জানাজানি হলে আকাশপুরের নাম হইহই করে সবদিকে ছড়িয়ে যাবে। সব 'নামকরা'দের টপকে আমরা একলম্বর 'নামকরা' হয়ে যাব।

হরেনকাকা বললেন, "এরকম একটা মূল্যবান জিনিস কাছে রাখতে পেরে আমি খুবই গর্বিত। বন্দুকটার সঙ্গে কত ঘটনা জড়িয়ে আছে। শুধু সাহেব আর জমিদার নয়, আছে পশুপাখির প্রতি মমত্ব, আছে দেশের জন্য ভালবাসা।"

সুমাল্য হেসে বলল, "গর্ব তো শুধু আপনি একা করলে হবে না হরেনকাকা। ভাগ আমাদেরও দিতে হবে। এবার আমরাও বুক ফুলিয়ে বলব, গর্ব করার মতো একটা জিনিস আমাদের আকাশপুরে আছে। এই বন্দুকের গল্প আমরা সকলকে করব।"

হরেনকাকা মাথা নেড়ে বললেন, "অবশ্যই করবে। গল্প করার মতোই তো ঘটনা।"

আমি বললাম, "শুধু গল্পে হবে না। আমাদের গ্রামে কেউ বেড়াতেটেড়াতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে। দেড়তলা পাকা বাড়ি। উঠোনটা মাটি দিয়ে নিকনো। ডাকাতদের মধ্যে থেকে একজন তাগড়াই চেহারার লোক মোটরবাইক থেকে লাফ দিয়ে নেমে সেই উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হরেনকাকার নাম করে শুরু করল হাঁকডাক। দরজা ভেঙে ফেলার হুমকিও দিতে লাগল। হরেনকাকা চোখ কচলাতে-কচলাতে বেরিয়ে এলেন। তিনি ডাকাতদের ব্যাপারটা জানেন না। জানবেন কী করে? আকাশপুরে তিনি এসেছেন তো মোটে বছরদেড়েক। আধো আলো, আধো অন্ধকারে মুশকো ডাকাতদের প্রথমটায় খেয়াল করতে পারলেন না। নাক টেনে বললেন, "তোমরা কে ভাই? রাতবিরেতে চেঁচামিচি লাগিয়েছ?"

তাগড়াই চেহারার ডাকাত চাপা গলায় বলল, "আমরা কেউ নই। আমাদের কাছে খবর এসেছে, আপনার কাছে নাকি একটা বন্দুক রয়েছে। খুব দামি। সাহেবদের জিনিস। আপনি ওটা আমাদের দিয়ে দেবেন, আমরা ভাল ছেলের মতো চুপচাপ চলে যাব। আমরা ক্লান্ত। তার উপর ভোরও হয়ে যাচ্ছে। হাতে মোটে সময় নেই।"

হরেনকাকা অবাক গলায় বললেন, "সে কী! বন্দুকটা তোমাদের দেব কেন?"

তাগড়াই ডাকাত হেসে বলল, "দাদু, ও জিনিস আপনার কোনও কাজে লাগবে না বলে দিয়ে দেবেন। আজ আমরা আকাশপুরে এসেছি শুধু ওই বন্দুকটা নিয়ে যেতে। খবর পেয়েছি, জিনিস নাকি খুব ভাল। জমিদারের জিনিস সঙ্গে রাখতে পারলে দলের কদর বেড়ে যাবে। যান, তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন দেখি।"

যারা এই দৃশ্য দেখেছে, তারা জানিয়েছে, হরেনকাকা নাকি তখন কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলেন, "ডাই, ওই বন্দুক আমার না লাগুক, এই আকাশপুরের মানুষের লাগবে।"

তাগড়াই ডাকাত হো হো আওয়াজে হেসে ওঠে। বলে, "কেন? আকাশপুরের লোকজন কি বন্দুক চালানো শিখবে? আরে বাবা, যার বন্দুক...কী যেন নাম?...আহা জমিদারমশাইয়ের নামটা বলুন না...আপনিই তো তাঁর গল্প বলেছেন আর সেই গল্প চারপাশে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে...হ্যাঁ, মনে পড়ছে...ব্রজেন জমিদার...ভিতু ব্রজেন জমিদারই কোনওদিন কাউকে বন্দুকের গুলিতে

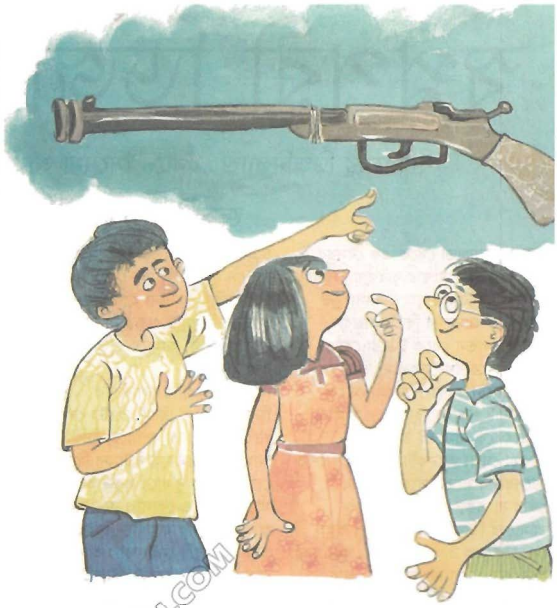

মারতে পারেননি...মানুষ তো দূরের কথা একটা পাখি পর্যন্ত না...আর আপনি বলছেন আকাশপুরের ভিতুগুলো বন্দুক চালাবে!...হা হা..."

এর পরই নাকি হরেনকাকা দুম করে বদলে যান। ঘুরে দাঁড়ান। ডাকাতের চোখে চোখ রেখে গর্জে উঠে বলেন, "কী বললে ছোকরা? ব্রজেন জমিদার ভিতু? আকাশপুরের মানুষ ভিতু?" কথা শেষ করে দু' পা এগিয়ে যান হরেনকাকা। মস্ত বড় হাঁ করে দাঁতখিঁচুনি দেন। তারপর কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সপাটে চড় কষান তাগড়াই ডাকাতের গালে। যেন ব্রজেন জমিদারের জঙ্গলের বাঘ থাবা তুলেও সেদিন সাহেবকে যে চড়টা মারতে পারেনি, সেটাই ডাকাতের গালে মারলেন হরেনকাকা। চারপাশ কাঁপিয়ে হরেনকাকা হুঙ্কার দিলেন, "ওরে, কে আছিস? বন্দুকটা নিয়ে আয় দেখি।"

বন্দুক নিয়ে আসতে হয়নি। হরেনকাকার আচমকা চড় আর হুঙ্কারে ডাকাতের দল ভয়ানক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ডাকাতকে যে মানুষ অমন দাঁত খিঁচিয়ে চড় মারতে পারেন, তিনি যে বিরাট সাহসী একটা মানুষ, তা বুঝতে সময় লাগল না তাদের। চড় খাওয়া তাগড়াই ডাকাত আগে বেড়া টপকে পালাল। ছুটে গিয়ে উঠল মোটরবাইকে। ডাকাতের দল মোটরবাইকে বিকট আওয়াজ করে আর ধোঁয়া ছেড়ে আকাশপুর গ্রাম ছেড়ে পালাল। তবে বেশি দূর পালাতে পারেনি। গ্রামেরই কেউ সাহস পেয়ে মোবাইল থেকে ফোন করে দিয়েছিল পুলিশ ফাঁড়িতে। ক্লান্ত ডাকাতদল এক কিলোমিটার যাওয়ার পরপরই বামালসমেত ধরা পড়ে যায়।

সেদিন বিকেলে হরেনকাকা আমাদের বললেন, "বন্দুকটা আসল কথা নয়, বন্দুকটা ঘিরে যে সাহসের ঘটনাগুলো আছে, সেগুলো আসল। আমরা আকাশপুরের মানুষ তার সঙ্গে আর-একটা নতুন ঘটনা যোগ করলাম মাত্র। আমাদের কাছে ব্রজেন জমিদারের বন্দুক থাকল কিনা তাতে কী এসে যায়? বন্দুকের সাহসটা তো আছে। তাই না?"

গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠেছে। আমরা ঠিক করেছি, এর পর থেকে সবাইকে আমরা বলব, "আমাদের গ্রামে দেখানোর মতো একটা জিনিস আছে। কিন্তু সেটা দেখা যায় না। তার নাম সাহস।"

ছবি: তিতাস পণ্ডা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~